ঋণের টাকায় ‘রোল মডেল’ | প্রথম আলো

google.com/amp/s/www.prothomalo.com/amp/story/bangladesh/cpai0for04

বাংলাদেশ

অভিমত
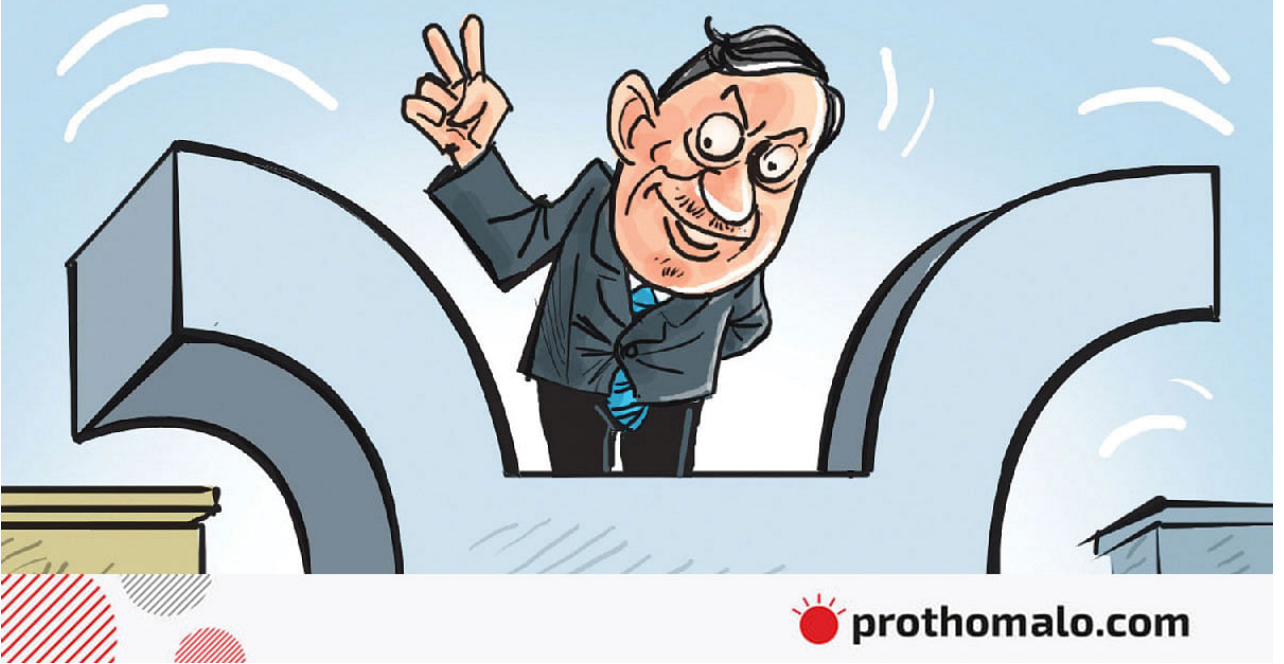
ঋণের টাকায় ‘রোল মডেল’

ঋণের টাকায় বিলাসবহুল রোল মডেল তৈরি হয়েছিল। চীন, ভিয়েতনামকে ছাড়িয়ে বিশ্বের শীর্ষ বড়লোক বৃদ্ধির দেশে পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু এখন কয়েক প্রজন্ম ধরে এই রোল মডেলের কিস্তিটা শোধ করবে কে? কম খাওয়া প্রবাসী শ্রমিক আর লোডশেডিংয়ে বিধ্বস্ত জনপদ?

২০১০ সালে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি ‘স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর’ বাংলাদেশকে বিনিয়োগের ‘উপযোগী’ হিসেবে ‘রেটিং’ দেওয়া শুরু করে। যেহেতু প্রথমবার রেটিং পায় বাংলাদেশ, মিডিয়ার আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

এরপর ২০১২ সালে বহুজাতিক বিনিয়োগ কোম্পানি গোল্ডম্যান স্যাকস তার ‘নেক্সট ইলেভেন’ তালিকা প্রকাশ করে। সেই তালিকায় বাংলাদেশকে বলা হলো ‘বিশ্বের উঠতি অর্থনীতির একটি’। এর পরপরই বিশ্বের শীর্ষ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক জেপি মরগ্যানের ‘ফ্রন্টিয়ার ফাইভে’র তালিকায়ও জায়গা পায় বাংলাদেশ। এরপর ২০১৭ সালে আরেকটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান প্রাইসওয়াটারহাউসকুপার্স ঘোষণা দিল, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৮তম বড় অর্থনীতি হবে। আর সেটাও হবে নাকি অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডসের মতো শক্তিশালী অর্থনীতিকে পেছনে ফেলে!

গার্মেন্টসের আয়, প্রবাসী আয়, মাথাপিছু আয় বাড়ছে, একের পর এক চমক লাগানো মেগা প্রকল্প হচ্ছে, মিডিয়া উচ্ছ্বসিত, অর্থনীতিবিদেরাও খুশি।

অথচ কেউ জিজ্ঞেস করে না 'নেক্সট ইলেভেন', 'ফ্রন্টিয়ার ফাইভ' এগুলো কী জিনিস? এগুলো আসলে কার কাজে আসবে? ২৮তম বৃহৎ অর্থনীতির মানে কী? অর্থনীতি '২৮তম' হলে গরিব মানুষেরা ঠিক কী সুবিধা পায়? মোটা চালের দাম কমে? আশুলিয়ায় ঘরভাড়া কমে? বাচ্চার দুধের খরচ দেয় সরকার? আর এই রেটিং এজেন্সিগুলো আসলে কারা? একেকটি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পেছনে তাদের ভূমিকা কী? ভালো রেটিংয়ের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনমান বৃদ্ধির আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে?

রেটিং দেওয়া হয় মূলত বিনিয়োগকারীদের জন্য। বিদেশি ব্যাংক, বিদেশি কোম্পানি, বিপুল পরিমাণ অলস পুঁজি নিয়ে বসে আছে। তাদের দরকার নতুন দেশ, নতুন মার্কেট। বিদেশি বিনিয়োগকারী তো দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। স্থানীয় মানুষের স্বার্থ রক্ষা হলো কি না, সেটা দেখা তার দায়িত্ব নয়। রেটিং ভালো মানে ব্যবসার ঝুঁকি কম। মানে সুদে–আসলে টাকা ফেরত আসবে। এজেন্সিগুলোর 'রেটিং' দেখেই ব্যাংক ঋণ দেয়, কোম্পানি বিনিয়োগ করে।

কিন্তু ভালো 'রেটিং' পেলেই কি উন্নয়ন হয়ে গেল? জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ইস্যুগুলোকে আড়ালে রেখে বিদেশিদের রেটিং বা ব্র্যান্ডিং নিয়ে মাতামাতি শেষ পর্যন্ত কী ফল দিল? বেশি বেশি বিদেশি ঋণ নিয়ে ২০২৩ সালে এসে বাংলাদেশের অবস্থাটা কী দাঁড়াল? অতিরিক্ত ঋণনির্ভর মেগা প্রকল্পগুলোয় অর্থনীতির অবস্থা ভালো হয়েছে, না খারাপ হয়েছে? রূপপুর, মাতারবাড়ী, পায়রা বা রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র কি জনগণের 'টার্মস' মেনে হয়েছে? এখন ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে জনগণকে পিষ্ট করা কেন?

প্রশ্নবিদ্ধ ঋণ, ক্ষতিকর প্রকল্প

একের পর এক প্রশ্নবিদ্ধ মেগা প্রকল্পের অনুমোদন হয়েছে, প্রতিটা মেগা প্রকল্পই একেকটা ঋণের ফাঁদ, অথচ আমাদের অর্থনীতিবিদেরা সরকারি লোকদের মতোই বলে গেছেন, আমাদের ঋণ-জিডিপির অনুপাত অন্যান্য দেশের তুলনায় কম, তাই চিন্তা নেই। অথচ একের পর এক মেগা প্রকল্পের সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত–বিধ্বস্ত প্রবাসী শ্রমিকের ঘাড়েই যে চড়তে হবে, সেই সতর্কবার্তা কি ছিল? মেগা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো যে বেশির ভাগই অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর, সেই বিশ্লেষণ কি ছিল?

৫১ হাজার কোটি টাকার মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৮৪ শতাংশই জাইকার ঋণ। ২১ হাজার কোটি টাকার মেট্রোরেলের ৭৫ শতাংশই জাইকার ঋণ। ১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকার রূপপুর প্রকল্পের ৮০ শতাংশই রাশিয়ার ঋণ! ২০১৫ সালেও আমাদের নিট বিদেশি ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। এখন হয়েছে প্রায় ১ লাখ কোটি টাকা। মাত্র ৮ বছরের মাথায় বিদেশি ঋণ বেড়েছে ২০ গুণ! এই বছর থেকেই বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ ২১ শতাংশ বাড়বে। ২০২৬ সাল থেকে শুধু রূপপুর কেন্দ্রটির জন্যই রাশিয়াকে পরিশোধ করতে হবে বছরে ১০ হাজার কোটি টাকা! অভ্যন্তরীণ ঋণ না হয় টাকা ছাপিয়ে শোধ করল, বিদেশি ঋণ কি ডলার ছাপিয়ে শোধ করবে?

কিন্তু এই সুদগুলো তো হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েনি। 'রেটিং ভালো', 'দেশ রোল মডেল হয়ে গেছে'—এসব দেশি–বিদেশি প্রচারণার পিঠে চড়েই তো দায়িত্বহীনভাবে দেশের জন্য ক্ষতিকর এসব প্রকল্পে লাগাতার ঋণ নেওয়া হয়েছে।

> **যুদ্ধের পর ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত, এমনকি শ্রীলঙ্কায়ও মূল্যস্ফীতি কমে এসেছে, তেলের দামও কমেছে, শুধু আমাদের এই একটা দেশ, যেখানে গরিবের বাঁচা-মরার সঙ্গে জড়িত প্রতিটি জরুরি পণ্যের দাম বেড়েই চলেছে। সাধারণ মানুষের মাছ, মাংস, ডিম খাওয়া বন্ধ হয়েছে, নতুন করে গরিব হয়েছে কয়েক কোটি মানুষ। ঋণের টাকায় বিলাসবহুল রোল মডেল তৈরি হয়েছিল, চীন, ভিয়েতনামকে ছাড়িয়ে বিশ্বের শীর্ষ বড়লোক বৃদ্ধির দেশে পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু এখন কয়েক প্রজন্ম ধরে এই রোল মডেলের কিস্তিটা শোধ করবে কে? কম খাওয়া প্রবাসী শ্রমিক আর লোডশেডিংয়ে বিধ্বস্ত জনপদ?**

'ক্ষতিকর' প্রকল্প বলা হচ্ছে কেন? কারণ, ঋণের টাকায় তৈরি প্রতিটা মেগা বিদ্যুৎ প্রকল্পই বিদেশি জ্বালানির ওপর শতভাগ নির্ভরশীল। শুধু রামপাল, পায়রা ও মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র চালাতেই আগামী কয়েক দশক ধরে ১ কোটি টনেরও বেশি কয়লা আমদানি করতে হবে প্রতিবছর! ২০২৭ সাল নাগাদ বছরে ২০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি কয়লা

আর এলএনজি আমদানি করতে হবে (দেখুন, ৫ বিলিয়ন ডলারই কষ্টসাধ্য, ২০ বিলিয়ন ডলারের সংস্থান হবে কি, *বণিক বার্তা*, ২০২৩)। অর্থাৎ এটা তো শুধু এক দফায় ঋণ করে ঘি খাওয়া না, বরং ঋণের টাকায় ঘি খাওয়ার রীতিমতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত!

অথচ প্রতিটি আমদানিনির্ভর প্রকল্পের বিকল্প ছিল। সস্তা ও পরিবেশবান্ধব বিকল্পই ছিল। ভারত এক দশকে আমাদের চেয়ে দুই শ গুণ বেশি সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ তৈরি করেছে। এদিকে অন্তত তিনটি আন্তর্জাতিক তেল-গ্যাস অনুসন্ধান প্রতিষ্ঠান (ইউএসজিএস, এনপিডি ও র‍্যাম্বল) বিভিন্ন সমীক্ষায় জানিয়েছে, বাংলাদেশের অনাবিষ্কৃত গ্যাসের মজুত ৩২ টিসিএফের ওপর (প্রায় ৩০ বছরের মজুত।)

পেট্রোবাংলা (২০২২) বলছে, 'আমাদের মোট চাহিদার ৭৩ শতাংশ গ্যাস আসে দেশি গ্যাসক্ষেত্র থেকে, খরচ পড়ে মাত্র পাঁচ হাজার কোটি টাকা, আর সেখানে বাকি ২৭ শতাংশ গ্যাস (এলএনজি) বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়, খরচ পড়ে ৪৪ হাজার কোটি টাকা! তার মানে দেশি গ্যাস অনুসন্ধান বন্ধ রেখে, সৌর-বায়ুবিদ্যুৎকে অবহেলা করে, ঋণের টাকায় কি সব বিদেশি কয়লা, বিদেশি এলএনজিনির্ভর প্রকল্প বানাচ্ছি আমরা!

শুধু তা–ই নয়, ঋণের টাকায় বানানো হয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্র। এ মুহূর্তে অলস বসে আছে ৯ হাজার মেগাওয়াট অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা (অর্থাৎ ঋণ নিয়ে যা বানিয়েছি, তার অর্ধেক অলস বসে থাকে।) এগুলোকে আবার বসিয়ে বসিয়ে 'ক্যাপাসিটি চার্জ' দিতে হয়। এই টাকার বিপুল অংশ আবার পাচার হয়ে যায়। এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে প্রতিটি প্রকল্পের উদ্ভট খরচ।

কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা (২০১৮) বলছে, বাংলাদেশের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মূলধনি ব্যয় বৈশ্বিক গড়ের চেয়েও অনেক বেশি (বৈশ্বিক গড় প্রতি কিলোওয়াটে ৫৫০ ডলার, বাংলাদেশের গড় খরচ ১ হাজার ডলার।) গবেষণা সংস্থা 'ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিকস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস' বলছে, বাংলাদেশের মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্রটি এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ব্যয়বহুল কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র (দেখুন, 'মাতারবাড়ী কোল প্ল্যান্ট ইন বাংলাদেশ কস্টস এইট টু টেন টাইমস মোর দ্যান কম্পেয়ারেবল প্ল্যান্টস ইন চায়না' ২০২২।) এদিকে বিশ্বব্যাংক (২০১৭) বলছে, এডিবির ঋণে তৈরি বাংলাদেশের ঢাকা-মাওয়া রুটটি পৃথিবীর মধ্যেই সর্বোচ্চ খরচের রাস্তা।

কৌশিক বসুদের 'বুমিং' বাংলাদেশ ও অর্থনীতিবিদদের দায়

২০১৮ সালে বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু *নিউইয়র্ক টাইমস*–এ কলাম লিখলেন: হোয়াই ইজ বাংলাদেশ বুমিং? বসু বাংলাদেশের 'বুম'–এর অন্যতম কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন গার্মেন্টস খাতের বিকাশকে। গার্মেন্টস খাত বিকশিত হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই 'বিকাশ' কি টেকসই? গার্মেন্টসের কর্মসংস্থান কি দারিদ্র্য দূর করে? অক্সফাম (২০১৯) দেখিয়েছিল, পোশাকশ্রমিকদের ৯১ শতাংশই পর্যাপ্ত পরিমাণ খেতে পায় না। ৮৭ শতাংশই ঋণগ্রস্ত। (দেখুন, মেইড ইন পোভার্টি, অক্সফাম, ২০১৯)

এই যে অটোমেশন গ্রাস করছে পোশাক খাতকে, গাজীপুর, আশুলিয়া, টঙ্গীতে নিয়মিত হাজারে হাজারে ছাঁটাই হচ্ছে, এই যে লাগাতার অর্থনৈতিক মন্দায় পশ্চিমের মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে, এই যে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ছে, পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলো কম মজুরিতে গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি করছে, এভাবে শুধু একটি-দুটি খাতকে কেন্দ্র করে দেশের অর্থনীতির মূল স্তম্ভটি গড়ে ওঠার বিপদগুলো নিয়ে বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদেরা কি সতর্ক করেন?

গার্মেন্টস আয়ের সীমাবদ্ধতা হলো, আয় করা ডলারের প্রায় অর্ধেক চলে যায় কাঁচামাল আমদানিতে। পাঁচ বছর ধরে গার্মেন্টস আয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ চলে গেছে শুধু সুতা আর ফেব্রিক আমদানি করতে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, গার্মেন্টস মালিকদের টাকা পাচার (দুদকের অভিযোগ, 'ওভার-ইনভয়েসিংয়ের' মাধ্যমে বছরে ৬৪ হাজার কোটি টাকা পাচার করে শুধু বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের মালিকরাই। দেখুন, দ্য নিউ এজ, ৩০ জানুয়ারি, ২০২১)। অর্থাৎ পোশাকশিল্প হচ্ছে সেই খাত যেখানে ডলার ঢোকে, আবার ডলার বেরিয়েও যায়।

খেয়াল করে দেখুন, বিদেশি কাঁচামাল, বিদেশি বাজার এবং বিদেশি কোম্পানির অর্ডারের ওপর নির্ভরশীল শিল্পটি বিশ্বব্যাংক ও তার সমচিন্তার অর্থনীতিবিদদের একচেটিয়া মনোযোগ পেয়েছে সব সময়। অথচ সম্পূর্ণ দেশীয় কাঁচামালে তৈরি, দেশের ভেতরে দুর্দান্ত ‘ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ’ তৈরি করা পরিবেশবান্ধব পাটশিল্প আর চিনিশিল্প নিয়ে তাদের বৈরী অবস্থান অবাক করার মতো। প্রশ্ন ওঠে, মূলধারার অর্থনীতিবিদেরা উচ্চ ঝুঁকির বিদেশি ঋণ, বিদেশি কোম্পানি, বিদেশি ‘অর্ডার’ ও বিদেশি বিনিয়োগকেই উন্নয়নের একমাত্র পথ হিসেবে দেখাতে চান কেন? স্থানীয় শিল্প, পরিবেশবান্ধব শিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি, বা স্থানীয়ভাবে তৈরি হওয়া লাখো কর্মসংস্থান নিয়ে আগ্রহ দেখান না কেন? পোশাকশিল্পের শ্রমিক ও প্রবাসী শ্রমিকের আয় নিয়ে গবেষণা করেন, কিন্তু ‘ম্যাক্রো’ অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে গিয়ে শ্রমিক যে আজীবন দারিদ্র্যের চক্র থেকে বেরোতে পারে না, তা নিয়ে চুপ থাকেন কেন?

এই যে অর্থনীতিবিদেরা অতিরিক্ত ঋণের ঝুঁকি নিয়ে আগের থেকে সতর্ক করেন না, এই যে রেটিং এজেন্সিগুলোর অতি উৎসাহী রেটিং–এর ওপর ভিত্তি করে ঋণের পাহাড় তৈরি হয়, এগুলো কি সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা? নাকি মূলধারার অর্থনীতিবিদেরা ঋণভিত্তিক মেগা প্রকল্প এবং প্রচুর পরিমাণে ঝুঁকিপূর্ণ অর্থনৈতিক লেনদেনকেই ‘বাড়ন্ত অর্থনীতি’ হিসেবে দেখান? নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান কিন্তু ২০০৮–এর বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে দায়ী করেছিলেন মূলধারার অর্থনীতিবিদদেরই। *ফোর্বস* ম্যাগাজিন দেখিয়েছিল, বিশ্বের সেরা অর্থনীতিবিদেরা ২০০৮-এর অর্থনৈতিক ধসের কিছুদিন আগেও আমেরিকার অর্থনীতির ফুলেফেঁপে ওঠা নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখিয়েছিলেন (দেখুন, হাউ ইকোনমিস্টস কন্ট্রিবিউটেড টু দ্য ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস, ২০১২)

আরেক নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎজ অর্থনৈতিক ধসের জন্য মূলত রেটিং এজেন্সিগুলোকেই দায়ী করেছিলেন। আমেরিকার ফিন্যান্সিয়াল ইনকোয়ারি কমিশন ২০০৮–এর বিপর্যয়ের কারণ তদন্ত করতে গিয়ে বলেছিল, এজেন্সিগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে ঋণ দেওয়াকে উৎসাহিত না করলে এই বিপর্যয় ঘটতই না। ক্রুগম্যান ২০০৯ সালে *নিউইয়র্ক টাইমস*–এ লিখেছিলেন তাঁর বহুল আলোচিত কলাম—হাউ ডিড দ্য ইকোনমিস্টস গেট ইট সো রং? তাঁর ভাষায়, অর্থনীতির ফাঁপা বেলুনকেই ‘উন্নয়ন’ হিসেবে দেখানো অর্থনীতিবিদদের একটি পুরোনো সমস্যা।

আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্য নয়, শিক্ষা নয়, স্থানীয় শিল্পায়ন নয়, মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি নয়, বৈষম্য দূরীকরণ নয়, বরং ঋণের টাকায় ফুলেফেঁপে ওঠা অর্থনীতির বেলুনটাকে নিয়েই এত দিন মাতামাতি করেছে সরকার। মেগা প্রকল্পে জিডিপি বেড়েছে, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মালিকের মুনাফা বেড়েছে, কিন্তু কর্মসংস্থান তৈরি হয়নি। বিদেশি ঋণের কিস্তি পরিশোধ মাত্র শুরু হয়েছে, এখনই ডলারে কুলাচ্ছে না। অভ্যন্তরীণ ঋণ শোধ করতে মধ্যবিত্তের গলায় পাড়া দিয়ে ট্যাক্স–ভ্যাটের আওতা বাড়ানো হচ্ছে।

যুদ্ধের পর ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত, এমনকি শ্রীলঙ্কায়ও মূল্যস্ফীতি কমে এসেছে, তেলের দামও কমেছে, শুধু আমাদের এই একটা দেশ, যেখানে গরিবের বাঁচা-মরার সঙ্গে জড়িত প্রতিটি জরুরি পণ্যের দাম বেড়েই চলেছে। সাধারণ মানুষের মাছ, মাংস, ডিম খাওয়া বন্ধ হয়েছে, নতুন করে গরিব হয়েছে কয়েক কোটি মানুষ। ঋণের টাকায় বিলাসবহুল রোল মডেল তৈরি হয়েছিল, চীন, ভিয়েতনামকে ছাড়িয়ে বিশ্বের শীর্ষ বড়লোক বৃদ্ধির দেশে পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু এখন কয়েক প্রজন্ম ধরে এই রোল মডেলের কিস্তিটা শোধ করবে কে? কম খাওয়া প্রবাসী শ্রমিক আর লোডশেডিংয়ে বিধ্বস্ত জনপদ?

- **মাহা মির্জা**, লেখক ও গবেষক